পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

কবিতার দৃষ্টিকোণ

শিল্প সাহিত্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা কেন প্রয়োজন হয়ে ওঠে সে নিয়ে আরো একবার কথা হোক। এই আলোচনার কোনো শেষ নেই কেননা এ বিষয়ে প্রশ্নের পঙক্তি যেমন নিঃসীম, তেমনি আলোচনার ক্ষেত্রও।

একটা মানভাষা থাকে, সমাজে, সাহিত্যে। যে ভাষায় গড়পড়তা মানুষ কথা বলে, লিখিত অবস্থায় বা শ্রুত অবস্থায় যে ভাষা মানুষ বোঝে। যে সমাজ, যে সংস্কৃতি মোটামুটি অবিশেষ, একপ্রকার, তার মানভাষা ততো বিস্তৃত, সার্বজনিন। কিন্তু ভারতের প্রায় যে কোনো অঞ্চলেই সমাজ তেমন নয়। অসাম্যে, বৈচিত্রে ভরা। এই নানারকমের অসাম্যের অনেকটাই হয়তো কাম্য নয়, কিন্তু কিছুটা অবশ্যই। বিশিষ্টতা, বৈচিত্র যতো বাড়ে, সমাজে মানভাষার জায়গাটা ততোই ছোটো হয়ে আসে। যেমন হিন্দীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। নামে 'রাষ্ট্রভাষা' কিন্তু রাষ্ট্রের ৪০%ও তা মেনে নিতে পারেনা। মানভাষার জায়গাটা ছোট হয়ে গেলে নানারকমের অসুবিধে, অসামঞ্জস্য ব্যাঙের ছাতার মতো চারপাশে গজিয়ে ওঠে সেটা ঠিক। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে বৈচিত্র ব্যাপারটা মানবিক; বৈচিত্র জাতির কৃষ্টি বাড়ায়, তাকে উন্নত করে। যতোদূর জানি, ভারতই জগতসভায় একমাত্র দেশ যে আড়াইশো বছরের সাহেবী জমিদারির পরেও এতগুলো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। অন্যান্য উপনিবেশের কাহিনী অপেক্ষাতর অনুজ্জ্বল।

এই মানভাষা যেমন, তেমনি একটা মান-সাহিত্য আছে। সব সাহিত্যে, কবিতায় অনেক কিছু থেকে যায় যার একটা 'মানসত্তা' রয়েছে। যেমন মান-লেখপদ্ধতি, মান-লেখবস্তু, মান-লেখচেতনা ইত্যাদি। অর্থাৎ মোটামুটি একই শব্দভান্ডার, একই বাক্যরচনা পদ্ধতি, একই লেখার বিষয় বা নির্বিষয়, একই অভিব্যক্তি, একইরকমের বোধ ও মূল্যবোধ, একই অনুভূতিমালা – কোনোটা মাঘের কোনোটা আশ্বিনের, (মাত্র একটি অঘ্রাণের) – এই পর্যন্ত। সোজা ইংরেজিতে – median writing – মাধ্যমিক রচনা। যার অনেকটাই পড়ামাত্র চেনা লাগে, চেনা-লাগাই ভালো-লাগা হয়ে দাঁড়ায়, এক অদ্ভুত স্বয়ংক্রিয়তায় (যাকে instinct বলা হয়) ডানহাত বাঁহাতের খোঁজ করে, একজন আরেকজনকে প্রবল হর্ষে চপেটাঘাত করে – মাঠে, ময়দানে, সদনে, ফেসবুকের 'লাইক' চিহ্নের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সেই সংঘর্ষধ্বনি – সোজা বাংলায় যাকে বলে 'হাততালি'। এইভাবে করতালি পেতে পেতে শেষে একদিন পুরস্কার। কবির জয়যাত্রার মোটামুটি এখানেই শেষ। 'চেনা রাস্তা চেনা পাড়া/চেনা রাতে কড়া নাড়া'। অচেনা কাজ, দেয়না সাড়া। এমনকি বাংলা কবিতার ঈশ্বর পর্যন্ত এব্যাপারে নিজেকে সাহস যোগাতে গেয়ে উঠেছিলেন, 'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে'। তিনিই সর্বোত্তম, কাজেই ব্যাপারটা আমাদের কতো আগে বুঝে গিয়েছিলেন! কিন্তু ওঁর সেই সাহস যোগানো, একরকম বৃথাই গেছে বললে খুব ভুল হয়না।

যাক গে! মান্যতার কথা হচ্ছিলো। এই মান্যতার অমানানসই যে লেখা, যে লেখার প্রয়াস; এই মান্যতাকে অমত বা 'অফেন্ড' করে যে লেখা, তার বদান্যতা স্বীকার না-করা যে

বেমানান লেখা - তাকেই আমি পরীক্ষানিরীক্ষার সাহিত্য বা কবিতা বলছি। এখন সাধ ক'রে 'বেমানান' হওয়ার পেছনে একটা ব্যক্তিগত রাজনীতি কাজ করে। অনেকরকমের মোটিভেশন। বিশেষ করে বাঙালির। অনেকরকম মান-অভিমান, ভিড়ে নজর কাড়তে অনেক গিমিকি উচ্চকিত প্রয়াস, তরুণরক্তের জেনেটিক বিপ্লবাত্মক ইত্যাদি। এর কোনোটাই কিন্তু দোষের নয়, কেননা এর মাধ্যমে একটা চর্চা অন্তত হয়, এবং সবাই না হলেও অনেকেই এইসমস্ত চর্চার মধ্যে দিয়ে একটা-দুটো স্বকীয়তা উপার্জন করে নেন। কিন্তু শেষমেশ, আমার কাছে অন্তত, তিনিই চিরপ্রণম্য কবি যিনি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মান্যতার পরিমিতি পরিসীমা বুঝে, স্বকণ্ঠ ও সাক্ষরশৈলিকে অর্জন করতে একাধিক সচেতন বুদ্ধিজীবিত প্রয়াসের মাধ্যমে অপরের থেকে নিজেকে আলাদা করেন। শুধুমাত্র 'মুদ্রাদোষে' নয়।

এক প্রয়াসী, সার্থক, কঠিন, অচেনা, প্রায়-রক্তাপ্লুত অবস্থা ও পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যিনি নিজেকে আলাদা করতে চান, ও পারেন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। সেটা না পারলে আমাদের অশিক্ষাই সারাগায়ে গোটা তুলে দিয়ে নিজেকে প্রমাণিত করে। এই প্রয়াসটাই পরীক্ষাকবি, পরীক্ষাসাহিত্যিককে চিহ্নিত করবে। এই সাহিত্যটাকে আমি ঝুঁকি-নেওয়া, ভিন্নতাকামি সাহিত্য বলবো।

পরীক্ষাকবিতার প্রথম ধাপ দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য এক নির্দিষ্ট খোঁজ থেকে আসবে। কাজেই প্রিরিক্যুইসিট হিসেবে খোঁজটাকে আগে বদলানো উচিত।

কয়েক মাস আগে, কর্মসূত্রে একটা বিশেষ ধরনের জ্যামিতিক গবেষণা করতে গিয়ে এক নতুন উপপাদ্যের সন্ধান পাই। **শিল্পশালা উপপাদ্য** বা **Art Gallery Theorem**। আমি যে কাজ করতে চাইছিলাম, এই উপপাদ্য তার হদিশ দেয় তো বটেই, আরো গভীরতর অর্থে আমার জীবন ও শিল্পভাবনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ফলে, কয়েক সপ্তাহ আমার চিন্তাজগতের সমস্তটা দখল করে ফেলে এই **'শিল্পশালা উপপাদ্য'**। শিল্প ও কবিতাভাবনায় অদেখা আলোর সংস্পর্শ টের পেতে থাকি। খুব বেশিদিনের পুরনো নয় এই উপপাদ্য এবং সাম্প্রতিক এক ঘোরতর বাস্তব প্রয়োজনে এর ব্যবহার বেড়েছে। সেটা জানতে, বুঝতে আমাদের আরো একবার কোনো শিল্পশালা বা স্মৃতিঘরে প্রবেশ করতে হবে।

দেশের বড় শহরে বা বিদেশে বিখ্যাত কোনো স্মৃতিঘরে যাঁরা গেছেন নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এক একটা তলায় অনেক শিল্পরক্ষী জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কখনো হয়তো এক একটা কক্ষে শিল্পরক্ষী নেই, কিন্তু সার্ভেলেন্স ক্যামেরা আটকানো রয়েছে দেয়ালের টঙে। সেই স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা স্বেচ্ছায় এদিক ওদিক ঘুরে নজর রাখছে গোটা হলঘর। দেয়ালে টাঙানো বা পেডেস্টালের ওপর রাখা কি কাচের শোকেসে সাজানো দুষ্প্রাপ্য সব শিল্পকীর্তির আয়ু ও আয়ত্ত রক্ষার্থে এই আয়োজন।

এখন কথা হচ্ছে, কজন রক্ষী বা কটা সার্ভেলেন্স ক্যামেরা শিল্পশালার এক একটা ঘরে বা তলায় প্রয়োজন? খরচ যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয়, সব শিল্পশালা কতৃপক্ষই সেটা দেখবেন। রক্ষীদের সংখ্যা অকারণে বাড়াবেন না। 'শিল্পশালা উপপাদ্য' বা আর্ট গ্যালারি থিওরেমের প্রয়োজন এখানেই। এই উপপাদ্য জ্যামিতিক বিশ্লেষণে বলে দেয়, এক একটা তলার আকৃতি অনুযায়ী কতগুলো ন্যূনতম রক্ষী বা ক্যামেরা সেই তলায় প্রয়োজন হবে। এবং ঠিক কোন দেয়ালের কোন কোণে তাদের রাখতে হবে। নিচের ছবির সাহায্যে ব্যাপারটা আরকটু স্পষ্ট করি।

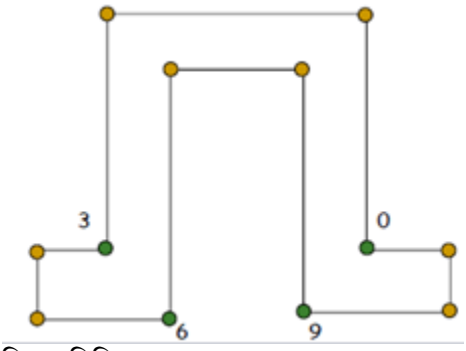

চিত্র-১ সিলিঙ থেকে দেখা ঘরের বহুকোণ ছক

আমরা জানি যে কোনো বাড়ির একটা সাধারণ ঘর আয়তাকার। সিলিঙের টিকটিকির চোখ দিয়ে দেখলে ঘরের দ্বিমাত্রিক চেহারা, বা প্ল্যানফর্ম একটা চতুষ্কোণ। বর্গ বা আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্র বা বর্গ এক উত্তল (convex) বহুকোণ (polygon)। অর্থাৎ যে কোনো দুটো দেয়ালের জোড়ে, বা যাকে সোজা বাংলায় ঘরের কোণ বলা হয়, সেখানে দাঁড়ালে গোটা ঘরটা দেখা যায়। ধরে নেওয়া যাক ঘরে কোনো আসবাব নেই, কেবল দেয়ালে দেয়ালে ছবি টাঙানো; উত্তলাকার যে কোন ঘরের যে কোনো কোণ থেকে সব দেয়ালের সব ছবির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে। সাধারণত শিল্পশালায় এটাই আমরা দেখি। ঘরের কোণে টেবিল পেতে বা ছোটো স্টুলে রক্ষীরা বসে রয়েছেন, বা দেয়ালের চূড়োয় রয়েছে ক্যামেরা। কখনোবা দুটোই। অতয়েব, শিল্পশালার যে কোনো উত্তলাকার ঘরের জন্য একজন রক্ষীই যথেষ্ট (এক যদিনা সে ঘর বিশাল বড়ো হয়)। কিন্তু ঘরের আকৃতি যদি অবতল (concave) হয়, একজন রক্ষীর পক্ষে সবটা দেখা সম্ভব না। চিত্র-১ এ দেখানো হচ্ছে এমনই এক শিল্পশালার এক তলার প্ল্যানভিউ। অবতলাকার দ্বাদশকোণে বারোটা শীর্ষকোণা বা vertex। ঘড়ির উল্টোদিক দিয়ে, ধরা যাক ০ থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত লেবেল দেওয়া হলো তাদের। ০-শীর্ষকোণা হলো এর প্রথমটা আর ১১ নম্বর অন্তিম। এখন ধরা যাক, ০-৩-৬-আর-৯ নম্বর কোণায় চারটে সার্ভেলেন্স ক্যামেরা বসানো হলো। প্রশ্ন – এই চারটে ক্যামেরা কি এতলার সমস্ত দেয়ালের সমস্ত ছবির দিকে নজর রাখতে পারবে? প্রশ্নটা দৃশ্যমানতার।

এবার চিত্র-২এর দিকে চোখ রাখি। আগের প্রশ্নের উত্তর এই ছবিতে। উত্তর – না। চিত্র-২ তে যে অংশটা ঘষা নয়, সাদাটে – সেই চতুষ্কোণের মধ্যে যা যা আছে রক্ষী-ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছে না। শিল্পশালা উপপাদ্যের কাজটাই এই নিয়ে। যদিও এই উপপাদ্যের সাথে শিল্পশালার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা এক সাধারণ জ্যামিতিক উপপাদ্য। অবতলাকার এক বহুকোণে ন্যূনতম কজন রক্ষী বসালে মিউসিয়াম ফ্লোরের সবটা দেখা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করে শিল্পশালা উপপাদ্য। কী বলছে এই উপপাদ্য?

শিল্পশালা উপপাদ্য

দ্বিমাত্রিক তলে ন-কোণাবিশিষ্ট (n) এক অবতলাকার বহুকোণ এলাকার সবটা দেখতে ন্যূনতম ন/৩ (n/3) সংখ্যক রক্ষীর প্রয়োজন।

চিত্র-২তে যে বিশেষ তলার চেহারা আঁকা হয়েছে সেখানে বহুকোণের বাহু ১২টা। এবং ন্যূনতম চারজন রক্ষী প্রয়োজন। ‘শিল্পশালা উপপাদ্য’ এটাই প্রমাণ করে। সবচেয়ে সরল

অবস্থার এক **ন**-বহুকোণের (এক সমকৌণিক অবতলাকার বহুকোণ যার **ন**-সংখ্যক বাহু) ক্ষেত্রে উপপাদ্য বলে যে ন/৩ বা n/3 জন রক্ষী সেই তলের সবটা দেখতে পাবে। আমাদের ছবিতে শিল্পশালার দেয়াল ১২টা।

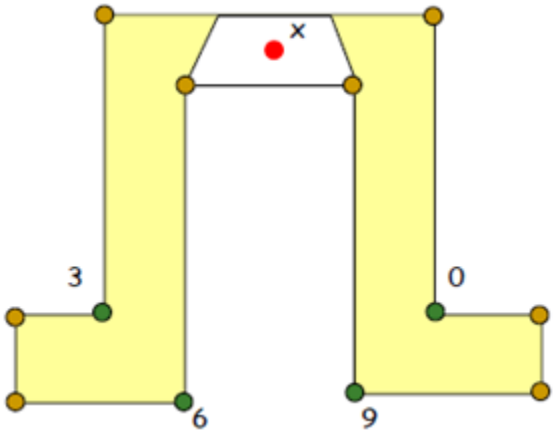

চিত্র-২ x-অবস্থানে যদি কোনো শিল্পবস্তু থাকে, সেটা সার্ভেলেন্স ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ না।

ফলে ন্যূনতম ১২/৩=৪ জন রক্ষীর পক্ষে পুরোটা দেখা সম্ভব হচ্ছে। এখন বহুকোণ যদি সমকৌণিক না হয়, যদি তার ভেতরে ছিদ্র বা শেকল (loop) থাকে তখন এই ফর্মুলা কিছুটা বদলে যায়। কিন্তু শিল্পশালা উপপাদ্য সরাসরি যেটা বলছেনা সেটা হলো এই ন/৩ (আমাদের ছবিতে ৪-জন) রক্ষীকে ঠিক কোন কোন কোণে বসালে তারা সেতলার সবটা দেখতে পাবে। এগুলো পরবর্তী উপপাদ্য বা সম্পাদ্য থেকে আমরা পাই। এবার পাঠিকা/পাঠকের উদ্দেশ্যে দুটো ধাঁধাঁ ছুঁড়ে দিই। প্রথম ধাঁধাঁ - বারোকোণের ঠিক কোন কোন কোণে রক্ষী বসালে সব দেয়ালের দিকে তারা চোখ রাখতে পারবে? উত্তর পরের পংক্তিতে।

এর অনেকগুলো উত্তর হতে পারে। একটা আমি দিচ্ছি। বাকিগুলো পড়ুয়াদের ওপর।
১-২-৫-১০

চিত্র-৩-এ ইউরোপের এক বিখ্যাত চিত্রশালার তিনতলার প্ল্যান এঁকে দিলাম। এই তলার শিল্পসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণে ন্যূনতম ক'জন রক্ষী বা সার্ভেলেন্স ক্যামেরা লাগবে, এবং এদের ঠিক কোন কোন কোণে বসাতে হবে - এই দ্বিতীয় ধাঁধাঁটা পাঠিকা/পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলাম। সমাধান করতে পারলে আপনি নিজেই এই ধরণের বহুকৌণিক তলের ক্ষেত্রে শিল্পশালা উপপাদ্যটা কী হবে নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন। প্রশ্নের সমাধান আগামী মাসের জন্য তোলা রইলো।

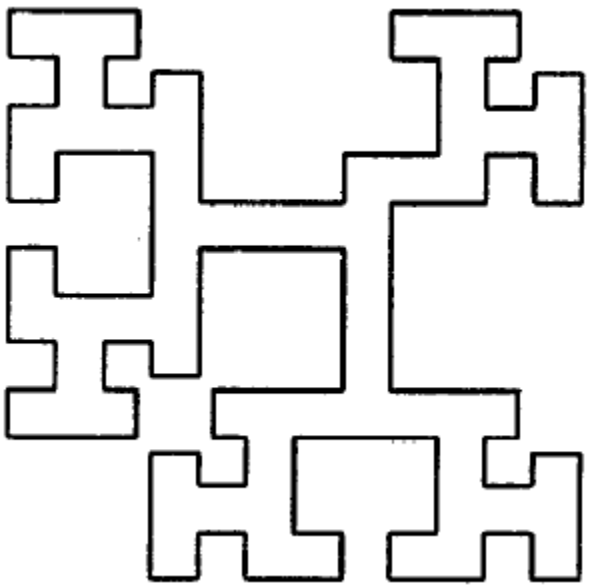

চিত্র-৩ ইউরোপের এক বিখ্যাত শিল্পশালার তিনতলার দেয়ালছক

এই পর্যন্ত এসে যে অবাধ্য প্রশ্নটার অপেক্ষায় আমি শরীর ঝুঁকিয়ে, শক্ত হাতে র‍্যাকেট ধরে অসযংমী দুলছি বেসলাইনের ধারে, সেটা এই – *সবই তো বুঝলাম দাদাভাই, কিন্তু কবিতালোচনায় এইসব গাণিতিক গণৎকারি কেন?*

কেন? বেশ, শুনুন। আর্ট গ্যালারি থিওরেমের প্রথম উদ্বেগ দেখার ক্ষমতা, দৃশ্যমানতা ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে। আমার মতে, কবিরও এটাই লেখার প্রথম উদ্বেগ। কীভাবে বলবো, কীভাবে প্রকাশ করবো, কীভাবে কোন নতুনতার, অভিব্যক্তির দ্বারস্থ হবো? – তারও আগে যেটা জরুরী – কী বলবো? কী ভাববো? কতোটা দেখবো? কী দেখবো? কেমনভাবে দেখবো? মানে – দৃশ্যমানতা, দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ – visibility, attitude, perspective। *শিল্পশালা উপপাদ্য* কিন্তু কোনো নিখুঁত, একক সমাধান দেয় না। শুধু একটা ন্যূনতমের কথা বলে – অর্থাৎ, অন্তত এটুকু দরকার। যা বৃহত্তর, তা অসীম। এর উত্তর একটা নয়, একাধিক। এই গণিত গণৎকারির দিকে যতোটা ঝোঁকে, তার চেয়ে অনেক বেশি জীবনের বাস্তবতার দিকে। এমনই আমার মনে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অন্য এক স্মৃতি এসে পড়ে। প্রায় বিশ বছর আগে জাতীয় দূরদর্শনের ‘এডুকেশন’ চ্যানেলে দেখা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা পুরনো সাক্ষাতকার। ততোদিনে শক্তি মারা গেছেন। কিন্তু ভিডিওটা মৃত্যুর বছরে তোলা হলেও কিছু পরে দেখানো হচ্ছে। তখন শক্তি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক। জীবনের শেষ বছর। দুপুরের দিকে একটা খোলা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতে সিগারেট। দূরদর্শনকে বলছেন বিশ্বভারতীর ছাত্র/ছাত্রীদের সম্বন্ধে- বলছেন, ওদের আগ্রহের কোনো অভাব নেই, অভাব ‘জীবনযাপনের’।

‘জীবনযাপন’? ‘জীবনযাপন’ উল্লেখযোগ্য হলেই কি অভিনব, ‘অদেখা’, অনভিজ্ঞ সাহিত্যের জন্ম দেওয়া যায়? ‘জীবনযাপন’ মানেই কি এক প্রত্যক্ষ আন্তর্ক্রিয়া? বছর চার-পাঁচ আগের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। ১৯৯০-এর প্রথমদিক। সম্ভবত তখনো সুতারকিন স্ট্রীট। নাকি! সেই প্রথম আনন্দবাজার অফিসে গেছি। ‘কৌরব-৫৪’ গদ্যসংখ্যা দিতে। বেশ কিছু লেখক-কপি। একটা সুনীলের, একটা সঞ্জীব চাটুয্যের, একটা শীর্ষেন্দু, একটা শক্তির। সবাইকে পেয়ে যাই। এক শক্তি ছাড়া। সুনীল বললেন – ‘ওতো এখানেই বসে থাকে,

আজো ছিলো, একটু আগেও তো ছিলো ... আচ্ছা, এক কাজ করো। 'অমুক' ডিপার্টমেন্টে দেখো, হয়তো ও ওখানেই ফিরে গেছে'। অর্থাৎ নিউজরুম। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো শক্তি নেই, কিন্তু ওঁর ডেস্কে খোলা হেডফোনটা পড়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে কেন জানিনা কমলদার (কমল চক্রবর্তী) কথা মনে প'ড়ে ঠোঁটে হাসি এসে গেলো। জামশেদপুরের বিখ্যাত টাটা মোটর্স কোম্পানীতেও চিত্রটা একইরকম – নিজের ড্রইং বোর্ডের সামনে কমলদার টেবিল। দেখা করতে গেলে পাশের চেয়ারটা টেনে কমলদা বসতে বলে। কিছুক্ষণ কথা হতে না হতেই ওঁর উর্ধতন এগিয়ে এসে 'চক্রাভর্তি'কে কাজের তাগাদা দেন। আমি অস্বস্তিতে পড়ি, কমলদা বলেন পাত্তা না দিতে।

খালি সীটের সামনে শক্তি চট্টো'র ফেলে রাখা হেডফোনের ছবিটা তথৈবচ। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একসময় শক্তি ফিরলেন। 'কৌরব-৫৪' দিতে না দিতেই চেয়ার থেকে উঠে বললেন, 'কৌরব? তুমি জামশেদপুর থেকে আসছো?... তাই? বেশ চলো...'। হেডফোন নামিয়ে রেখে আবার উঠে পড়লেন। সেখানে এদিকে দূরদেশের খবর আসছে – টরেটক্কা টরেটক্কা, টক্কা টক্কা টরে টরে! হায় সংবাদ পরিক্রমা! হায় দূর দেশের বন্যা, ভিন রাজ্যের রাজনৈতিক টালমাটাল! আগেই বলেছি ১৯৯০ দশকের শুরু। তখনো সুতারকিন ..., থুড়ি, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ি। একপাশে বিরাট ক্যাম্বিসের ছাউনি। তার নিচে শ্রমিকদের জন্য কিছু চা-বিস্কুট, শ্রমিকি ভাত-ডালের দোকান। তারই একটাতে ঢুকে শক্তি বললেন – 'ভাত খাবে তো?'। মাথা খারাপ! ফুটপাথের দোকানে ভাত! পরম ভদ্রতায় বললাম – 'খেয়ে এসেছি'।

- চা খাবে তো?
- হ্যাঁ
- এই ছেলেটা, এইইই...

(ছেলেটি আসে)

এই, দু জায়গায় দুটো চা আর তিনটে ক'রে বেগুনি দেতো...।

- এদের বেগুনি ভালো বুঝি!
- খাওনি তো! খেয়ে দেখো, দারুণ! আচ্ছা, কৌরব দারুণ কাগজ জানো! দারুণ কাগজ (কাগজ না দেখেই)... আচ্ছা, কমল কেমন আছে! তোমায় তো গেলবার দেখিনি? দেবজ্যোতি...তারপর স্বদেশ, বারীন, আর ওই যে...ওর নামটা... শংকর লাহিড়ী... ওরা কেমন আছে? তুমি স্বদেশকে চেনো? জানো স্বদেশ ...

এরপর জীবনযাপন নিয়ে শক্তি নানারকম কথা বললেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বল-বিয়ারিঙের ওপর সাহিত্যের উৎকর্ষ কীভাবে হিঞ্জ করে থাকে – এইসব। শুনতে শুনতে, সেই প্রথম হয়তো, ছেলেবেলার সর্বোচ্চ কবি সম্বন্ধে কেমন উদাসীন হয়ে গেলাম। সিনেমা, বইপত্র, নাটক, সঙ্গীত, অন্যশিল্প, অন্য পেশা, অন্য বিষয়, ভিন সাহিত্য – কত কী মজে যাবার মতো, কিন্তু সৎ কবিতাকে, মহৎ কবিতাকে খুঁজতে হবে শুধু রাস্তায়, শুঁড়িখানায়, জলছত্রে, সোনাগাছিতে, বেড়াতে যাবার জীপে, হ্রদের মাঝের দ্বীপে? পাহাড়ের টঙে, সমুদ্রের স'নে?
বিনয়ে? সুনীলে? শক্তিতে কেবল?

ধ্যুর! কী যে বলেন মশাই!

এক বহুকৌণিক শিল্পানুসন্ধান না থাকলে কবিতা হয় নাকি? আপনার হয়তো হয়, আমার হয় না। মুখে কিছু বলি না। মনে মন ভাঙে। বাড়ি ফেরার পথে আমি ভাবতে থাকি। বাসের দোতলায় গুম হয়ে বসে থাকি। সেদিন থেকেই মূলত আমি আর 'শাক্ত' নই।

'অভিজ্ঞতা', সুতরাং 'দেখা' নয়। এইটা মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। অভিজ্ঞতা 'অনুভূতি'ও নয়। অভিজ্ঞতা এক চৈতন্যাবস্থান যেখানে যাবার অনেক রাস্তা রয়েছে, যার সবচেয়ে বহুব্যবহৃত (এবং বলাই বাহুল্য, ভিড়ে ও খানাখন্দে ভর্তি) রাস্তাগুলো দৃশ্য, কাহিনি ও অনুভূতিনির্ভর এক লৌকিক দার্শনিকতা দিয়ে বড়োজোর নির্মিত হয়। অন্য যে রাস্তাগুলো - অল্প বা অব্যবহৃত, হয়তো নির্মিত পথও নয়, প্রয়োজনে তৈরি করে নেওয়া, পাহাড়ের পথে যেমন বহু অভিযাত্রীদলকে নিজেদের পথ এক এক সময়ে তৈরি করে নিতে হয়। একই সঙ্গে এমন তর্ক করা যায় যে না, 'অভিজ্ঞতা' এক 'দেখা'ই। দৃশ্য বা ভূখন্ড বা জীবনের নাটক দেখা নয়, এক সত্যিকারের 'দেখা' – শব্দশাস্ত্রের সমস্ত আদি অর্থে দর্শিত এক 'দর্শন'। এই ভাবনাকেও খন্ডন করা যায় না, যদিও একুশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কবিতা 'দর্শন' – এমন ভাবনা গলির বাঁকে প্যাঁক খেয়ে যেতে পারে এটাই মনে রাখতে হয়।

মোটমাট 'শিল্পশালা উপপাদ্য' বা আর্ট গ্যালারী থিওরেম একই জিনিসকে নানাকোণ থেকে দেখাতে শেখায়। দেখাবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। দেখা এক জিনিস, তার ফলন অন্য ব্যাপার। উপপাদ্যের গ্রাহক কীভাবে, ঠিক কী প্রয়োজনে একটা উপপাদ্যকে গ্রহণ করবে, তাকে ব্যবহার করবে সেটা তার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। কেন আর্ট-গ্যালারী থিওরেমকে খুঁজে বের করতে হলো?

আমি পেশায় এক গাণিতিক জেলে। অর্থাৎ এক জেলে যা করে আমার কাজ তার একাংশের মতো। মাছ ধরা ছাড়াও জেলেরা জাল বোনে। অন্তত আমাদের দেশে। অধিকাংশ জেলে। পশ্চিমে জাল বানায় বড় কোম্পানীগুলো, সেই জাল জেলেরা কিনে নেয় বাজার থেকে। তো, আমার কাজ ওই – জাল বোনা। তবে এই জাল বুনতে হয় গণিতের মাধ্যমে, কম্প্যুটরের সাহায্যে। কী কাজে লাগে এই জাল? উত্তর সহজ – জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ, সবেতেই লাগে। গাড়ি, বিমান, জাহাজ, সেলফোন থেকে যে কোনো যন্ত্রনির্মানে যেমন, তেমনি গ্রাফিকশিল্পে, অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে, সিনেমার *কার্যতবাস্তবে* (virtual reality) এমনকি সম্প্রতি জানলাম ব্রা-য়ের নকশায়। নকশার জাল – জিনিসটা ভাবায়। ব্যাপারটা অনেকটা মানবশরীরের অভ্যন্তরের কঙ্কালের মতো।

মনে করা যাক, আপনি এক বন্ধুর বাড়িতে বসার ঘরে। বই পড়ছেন, বা বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময় আপনার বন্ধু তার অন্য কিছু বন্ধুবান্ধবীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। আপনি তাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে কী দেখবেন? মানুষ সাধারণত প্রথমের মুখের দিকে তাকায়, মুখগুলো চেনার চেষ্টা করে, মুখভঙ্গিগুলো পরীক্ষা করে নিয়ে দ্রুত বুঝে নিতে চায় তাদের সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা, ইত্যাদি। কেউ কেউ হয়তো মুখের দিকে না চেয়ে শরীরের অন্য অংশ বা পোশাকআশাকের দিকে চাইবে। কেউ হয়তো তাদের বয়ে আনা জিনিসপত্রের দিকে। আবার কেউ হয়তো তাদের দিকে চাইবেই না। আমি যদি বলি আমি তাদের সকলের দিকেই চাইবো এবং তাদের মুখ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পোশাকআশাক না দেখে দেখে নিতে চাইবো প্রত্যেকটা শরীরের অভ্যন্তরের কঙ্কালকে? আমাকে হয়তো অনেকেই উন্মাদ বা বিকৃতমস্তিষ্ক ভাববেন। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা ওই রকমই। মানবশরীরের নেপথ্যে রয়েছে তার কাঠামো - কঙ্কাল বা দেহপঞ্জর। সেটাই তার দেহের

মৌলিক আকৃতি, যে জায়গায় সমস্ত মানুষ আসলে প্রায় একরকম। সেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, শিক্ষা, সংস্কৃতির ভেদাভেদ নেই। অন্য ভেদাভেদ আছে, যা কাঠামোগত। অবিকল একভাবে, এ দুনিয়ায় যত ছবি আমরা পর্দার ওপর দেখি – অর্থাৎ গ্রাফিক ইমেজ - জেরক্স করা ফোটোকপি, প্রিন্ট-আউট, আলোকচিত্র, এম-আর-আই স্ক্যান, আল্ট্রা-সাউন্ড ছবি ইত্যাদি সমস্ত সমস্ত রকমের প্রত্যেকটা 'নকল' ছবির নেপথ্যেই রয়েছে এমন এক জাল বা mesh। 'নকল' বললাম কেননা আজকের সাংখ্যিক (digital) পৃথিবীতে 'আসল' ছবি বলে কিছু নেই। 'আসল' ছবি রেমব্রান্ট আঁকতেন। চিত্র-৪ এ এর একটা নমুনা দিলাম।

চিত্র-৪ বিখ্যাত বুদ্ধ-ভাস্কর্যের ছবি রেন্ডারিং-এর জন্য ত্রিমাত্রিক জালে আচ্ছাদিত।
ভাস্কর্যের একাংশ কেটে দেখানো হয়েছে জালটা চতুস্তলী – অর্থাৎ টেট্রাহিড্রাল মেশ।

সমস্ত ডিজিটাল ছবিই এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তাকে সহজেই নকল করা যায়। অর্থাৎ 'কপি'। ছবির 'মেশ' বা জালের ওপরেই আলো, রঙ, ছায়া, বর্ণ-তারতম্য (বা hue) ফেলে, মেশের প্রত্যেকটা "কোষ"-এ এইসব প্যারামিটারের অদলবদল ঘটিয়েই ফুটে ওঠে ছবি। দৃশ্যায়নের জন্য যেমন এই জালের প্রয়োজন হয়, তেমনি কারিগরী বিশ্লেষণের জন্যও।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, সর্বত্র, প্রায় সমস্ত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রায় যে কোনো প্রযুক্তবস্তু নির্মান করার সময় প্রথমে একটা নকশা করা হয় তার। পরে নকশাটাকে বাজিয়ে নেওয়া হয়, বা সিদ্ধ করে নেওয়া হায়, তার বৈধতার প্রমাণ নেওয়া হয় কারিগরি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। নানারকমের বিশ্লেষণ পদ্ধতির একটাকে বলে সসীম মৌল বিশ্লেষণ বা Finite Element Analysis। এই সমস্ত রকমের বিশ্লেষণেই প্রায় জালের প্রয়োজন হয়। নকশাবস্তুটাকে জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। তারপর অ্যানালাইসিস। এসমস্তই বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কম্প্যুটর সফটওয়েরের মাধ্যমে। CAD (Computer Aided Design) ও CAE (Computer Aided Engineering) সফটওয়ের। গভীর গাণিতিক এই বিশ্লেষণ দেখিয়ে দেয়

জালের কোন কোন জোড়ে নকশা দুর্বল। সেইসব জায়গার আকৃতি বা গঠন বা মালমশলা তখন বদলানো হয়। বদলে আবার বিশ্লেষণ। এইভাবে কিছু আইটারেশন চলে যতক্ষণ পর্যন্ত নকশা নিখুঁত হচ্ছে।

কবিতালোচনায় এই সমস্ত প্রসঙ্গ টেনে আনার একটা মুখ্য উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে আলোকচিত্র বা চলচ্চিত্র বা যে কোনো শিল্পনির্মানের পেছনেই যেমন এক বা একাধিক প্রক্রিয়া রয়েছে তেমনি কবিতারচনার নেপথ্যেও। শিল্পী কেবল তার অনুভূতির প্রাবল্যে, তার বোধের তীব্রতায় সাদা পাতার ওপর কলম খুলে শিল্প নির্মান করে ফেলবেন – সেই মাহূর্তিক, স্নায়ুসর্বস্ব, জোলো শিল্পের প্রতি আমার অন্তত কোনো শ্রদ্ধা বা নিবেদন নেই। যে কোনো কবিই তার নিজের কবিতা রচনার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সম্বন্ধে যতো ভাববেন, যতো হুঁশিয়ার হবেন ততোই তিনি তাঁর শিল্প সম্বন্ধে সচেতন। আর এই সচেতনতাই সেই ছেনি, সেই উকো, সেই সেতার, সেই রঙ ও ইজেল যা তার শিল্পকে উৎকর্ষ এনে দেয়। প্রোন্নত কারিগরি যা করে তা খুব আলাদা নয়। অতিপ্রাচীন সমাজে যে ছিলো কুমোর সে ছিলো শিল্পীও বটে, ইঞ্জিনীয়রও বটে। নীল নদের ধারে আদি মিশরীয় সভ্যতাই হোক আর মোহেঞ্জোদারো, সে যুগের মানুষের খাবার গেলাস ভালো করে লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যাবে। আধেয়র জন্য আধার। জল খাবার জন্য গেলাস। সে যেমন খুশী একটা হলেই হলো। কিন্তু মানুষ সেভাবে তাকে গড়েনি। তার গঠন, আকৃতি, বাইরের কারুকার্য, ভিতের গড়ন – সমস্তই প্রমাণ করে যে কার্যকারিতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সেই আদিমানবের কাছে, তেমনি নান্দনিকতাও। কুমোর যেমন কারিগর ও শিল্পী দুইই, তেমনি কবি ও ইঞ্জিনীয়র - উভয়েই। স্থাপত্যকে হয়তো এই জন্যেই শিল্পমাতা বলা হয়। যে কবি এসব শুনে হাসছেন, যে বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনীয়র নাক শিঁটিকাচ্ছেন, আগামী একশো বছর পরের গ্রাম থেকে তাকে মাথা ন্যাড়া করে, ঘোল ঢেলে, রোবট-গাধার পিঠে চড়িয়ে বের করে দেওয়া হবে। এ তর্কাতীত। এই বাক্যের পর হাতের কাছে একটা এক-চোখ-টেপা-হাসিমুখের ইমোটিকন খুঁজছিলাম।

ইতিমধ্যেই বিদেশে ও আমাদের দেশের কোনো কোনো অংশেও (যেমন আমেদাবাদের জাতীয় নকশার স্কুলে) বেশ কিছু যন্ত্রী ও কখনো ইঞ্জিনীয়র এমন কিছু শিল্প নিয়ে কাজ করছেন যা শিল্পও যেমন, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিও। এই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে যাই শিল্পশালা উপপাদ্যে। কেন এর প্রয়োজন হয়ে পড়লো সেটা বোঝাতে। চিত্র ৫-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দ্বিমাত্রিক আকারের ওপর জাল ফেলা। এই আকার মার্সিডিস গাড়ির কোনো যন্ত্রাংশের এক টুকরো, না রাজা অয়দিপাউসের মঞ্চাভিনেতার মুকুটের সেটা বলছি না। দুটোই সত্যি হওয়া সম্ভব। চিত্র-৫ এর প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা জাল ওই আকারের ওপর ফেলা হয়েছে। মূলত চতুষ্কোণি ওই জাল কিন্তু ‘নিখুঁত’ নয়। ‘নিখুঁত’ বা ‘মাপাজাল’ বা mapped mesh তাকেই বলা চলে যেখানে কোনো ত্রিকোণ নেই এবং সমস্ত চতুষ্কোণ সারিসারি সাজানো, আকৃতির ভেতরের প্রত্যেকটা জোড় বা node চারধারে চারটে চতুষ্কোণের সাথে লাগানো।

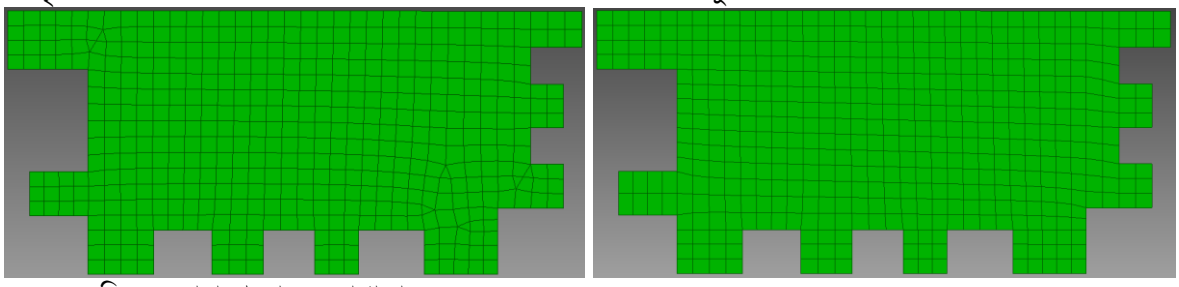

চিত্র-৫ সাধারণ জাল ও মাপাজাল

মাপাজাল বিশ্লেষকরা পচ্ছন্দ করেন নানা কারণে। ওইরকম জাল বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হলে গণিতের প্রমাদ কম হয়। যেকোনো চারকোনা আকৃতিতে মাপাজাল ফেলা কোনো ব্যাপার নয় এটা বোঝা যায়। কিন্তু আকার চারকোনা না হলে সেটা চ্যালেঞ্জ। কর্মক্ষেত্রে একদিন এইরকমই এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে আমি অনুসন্ধান করতে থাকি এমন এক অ্যাল্গরিদ্‌মের যা যেকোনো আকারকে এক গুচ্ছে চারকোণা আকারে ভেঙে দেবে। এভাবে ভেঙে ফেলা প্রতিটি চূর্ণ-আকার যদি চারকোণা হয়, প্রত্যেকটাতে মাপাজাল ফেলে দেওয়া সহজ, সেটাই চিত্র-৫ এর দু-নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই ভাঙন- অ্যাল্গরিদ্‌মের খোঁজই আমাকে শিল্পশালা উপপাদ্যের কাছে নিয়ে আসে। এই ধরনের এক মাপাজাল অ্যাল্গরিদ্ম লিখি বছর দশেক আগে। এর সাহায্যেই সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করা CURIOSITY Mars Rover এর নকশা করা হয়। সেই ভ্রামকের নকশার কিছু ছবি ও খবর পাওয়া যাবে নিচের ইউ-আর-এল-এ

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?Component=186732&ComponentTemplate=1481#lightview-close

প্রযুক্তির উদাহরণের মতো মানবজীবনও পলিগনাল বা বহুকৌণিক। সেটা আমরা নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ও ভাবনার মধ্যে দিয়েই টের পাই। কাজেই জীবনের পড়া ছায়ায় আমাদের শিল্পবস্তু ও শিল্পভঙ্গিও যে পলিগনাল হয়ে উঠবে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? বহু ধারায়, বিষয়ে, জ্ঞানশাখায়, শিল্পে, সম্পদে ছড়িয়ে পড়বে কবিতা। আর তাই হচ্ছে। অধিকাংশের লেখায় না হলেও নিশ্চিতভাবে কিয়দংশের রচনায়। আর এটা খুব সম্প্রতি হচ্ছে এমন নয়, হচ্ছে বিশ শতকের নানা সময় জুড়ে। খাপছাড়াভাবে। মার্কিন কবিতা থেকে একটা গোড়ার দিকের উদাহরণ নিতে গেলে ওয়ালেস স্টিভেন্সের কবিতার কথা আসে। রুশ কবিতায় পুশকিন, পাস্তারনাক ইত্যাদি। একটা কবিতা দেখা যাক। ওয়ালেস স্টিভেন্সের এক বিখ্যাত কবিতা যাকে অবান্তরতা, অনিশ্চয়তা, কবিতা-বিষয়ক-কবিতার এক শিরোধার্য সৃষ্টি মনে করা হয় আজো। '**Notes Towards A Supreme Fiction**' কবিতাটা স্টিভেন্স লেখেন ১৯৪২ সালে। অনেকেই জানেন ওয়ালেস স্টিভেন্সের সাথে বড়ে গোলাম আলির মিল এখানে যে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ওঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত কবিতায় স্টিভেন্স তিনটে মূলমন্ত্র (যা কবিতার উপশীর্ষকও) ব্যবহার করেছেন – 'ওকে বিমূর্ত হতে হবে', 'ওকে পরিবর্তনশীল হতে হবে', 'ওকে তৃপ্তি দিতে হবে'। 'ও' – অর্থাৎ কবিতা। এখানে বদলানো বা বহুবিষয়ী হবার কথাটার ওপর জোর দিলাম। নিচে দেখা যাক কবিতার একাংশ, মূল ইংরেজিতেই -

Notes Towards A Supreme Fiction (parts)

Wallace Stevens

.....

Two things of opposite natures seem to depend
On one another, as a man depends
On a woman, day on night, the imagined

On the real. This is the origin of change.
Winter and spring, cold copulers, embrace
And forth the particulars of rapture come.

Music falls on the silence like a sense,
A passion that we feel, not understand.
Morning and afternoon are clasped together

And North and South are an intrinsic couple
And sun and rain a plural, like two lovers
That walk away as one in the greenest body.

In solitude the trumpets of solitude
Are not of another solitude resounding;
A little string speaks for a crowd of voices.

The partaker partakes of that which changes him.
The child that touches takes character from the thing,
The body, it touches.

...

প্রথমেই বলা হচ্ছে – পরস্পরবিরোধী কতকিছুই আছে যা অনবরত একে অন্যের ওপর নির্ভর করে। দিন-রাত, নারী-পুরুষ ইত্যাদি নানা বাইনারির কথা আসে। অর্থাৎ একটা জটিল, আয়তভাবনাকে টুকরোয় ভেঙে ফেলা হচ্ছে, সরলতার সাধনায়। টুকরোগুলোকে বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয়না। সমষ্টির দিকে তাকালে সব গোলমাল হয়ে যায়। ওই যে স্টিভেন্স বললেন – 'পরিবর্তনশীল হতে হবে' (It must change) –ওখান থেকেই বিষয় বা সূত্র বদলানো, digression বা অবান্তরতার প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাবনা। গণিতের বহুকোণকে যেমন কিছু সরল আকারে ভেঙে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়, এক তাল আকারহীন মাখা ময়দার তালকে বেলে, সমতলে ফেলে, তার থেকে ছোটো ছোটো নিখুঁত তেকোনা নিমকি কেটে নেওয়া যায়, তেমনি এই বিচূর্ণায়ন-পদ্ধতির সাহায্যে কি কোনো শিল্পসাধন সম্ভবপর? সমাহারিক জ্যামিতি (combinatorial geometry) ও দর্শনের ভাবনা আমাকে দখল করে বসে এখানেই। ওয়ালেসে স্টিভেন্সের ৪২ সালের কবিতায় এই পলিগনাল বিভাজনের এক সহজরূপ পেয়ে যেতে থাকি। এখানে প্রসঙ্গান্তরে এমনও বলি যে শুধুমাত্র কবিতা বা শিল্প রচনায় নয়, কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রেও শিল্পশালা উপপাদ্য-কে ব্যবহার করে কবিতার গোটা দৃশ্যমানতা নির্ধারণ করা যায়; তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণকেও বহুকৌণিক বিভাজনের দ্বারা নিপুণ করে তোলা যায়।

অনেক দশক টপকে, ভাষা বদলে সব্যসাচী সান্যালের ২০১২ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ব্র্যাকেটশহর' এর একাংশ দেখা যাক -

মিঃ বীন বললেন – life comes a full circle

আমি ভাবছি - A circle is a denominator of my own loneliness
pervading through society and landscape
encompassing but leaving things alone to their own loneliness

ক্ষণবিভাগের আলো
সারাজীবনের আলো
আলোর মধ্যিখানে নির্লিপ্ত পলতে
বাঞ্ছনীয় কাটা ঘুড়ি
ওহো তার নিজস্ব হাওয়া

কাঁপলো প্রদীপ

যত কাঁপা তত বেড়ে ওঠা
তত আলো
স্বাভাবিক বেড়ে উঠছে
আমি ও আমার স্বগতোক্তি

হদ্দ ঘুরিয়ে আনা ডালিমকান্ডে

হে একাকীত্ব হে বেড়ে ওঠা হে আদ্যন্ত ব্র্যাকেটশহর

--

ব্র্যাকেটশহরে
ঘাঘু পর্যটক

আমার শহর আর আমারই দোটানা
মূলত তন্দ্রাবোধ
কাচের বোতলে
ঘুমিয়ে পড়ছে সার্বভৌম শোক
শোকের এককগুলি জায়মান

ঘুরে দাঁড়ানোর পায়ে হাতের চিহ্ন
চিহ্নের শৃঙ্গার-প্রবণতা নিয়ে

তিনশো বছর কাটিয়ে উঠছে যে অটুট দেয়াল
তার আগামীর শর্ত একটি ফাঁকের সম্ভাবনা

ঘাঘু পর্যটক
আমি ত বসন্তের কাছে জানতে চাইবো না
উৎসবের মানে ও সূত্র
হলুদ উড়ে যাচ্ছে যে প্রাণপণ ঘুড়ি
তার কাছে বর্ণতার রাখা আছে ঘটনাপ্রদাহ
মানমন্দিরের দূরবীনে ছোট হচ্ছে আলো
তীব্র হচ্ছে

আমার দোটানার মাঝে
রাখা হচ্ছে ছুরি
আর
শোকের এককগুলি ডাকে

--
সোফোক্লিস বলছিলেন এই যে -- শোকগাথা, দেয়ালগীতি এগুলো সবই সমুদ্রঅশ্বদের জন্য লেখা । খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩৯-এ । সভ্যতা তখন নির্ভরশীল সমুদ্রশস্যের ওপর । সমুদ্রঅশ্বরা কর্ষণ করতো জলতল । ঘুরিয়ে আনতো পুষ্টি । কার্থেজীয় নৌসেনা শুরু করে এক জৈবযুদ্ধ। ওরা এক নতুন প্রজাতির হিংস্র ডায়াটম ছেড়ে দেয় উপকুলে । ডায়াটমগুলি এক অভূতপূর্ব স্নায়ুবিষে কাবু করে ফেলতো পুরুষ অশ্বদের ও তাদের সন্তানথলিতে সদ্যজাত অশ্বের মস্তিষ্কে জারি করতো নিজস্ব প্রজনন। সদ্যোজাত অশ্বগুলি বিকৃত ও অশ্বমাংসলোভে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। বিশদ গবেষণার পর মহামতি আর্কিমিডিস ,মোৎজার্ট ও মেহদী হাসান যৌথভাবে আবিষ্কার করেন এই গীতি। এবং শুশুকদের কণ্ঠে তা স্থাপিত হয়। কথিত, এই সংগীত ডায়াটমগুলির মধ্যে সৃষ্টি করে পাল্টা উন্মাদনা ও তাদের আত্মহত্যায় বাধ্য করে। যদিও মহর্ষি দেকার্তের মতে ডায়াটম একটি এককোষী জাতী-উন্মাদনা ও আত্মহত্যা --বিশেষ algaeয় কমপ্লেক্স ব্যবহার একমাত্র জটিল প্রাণীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ যেমন মানুষলেমিং ,, ভারতীয় হস্তিনী । দেকার্তের মতে এই গীতি আসলে এক তরঙ্গধর্মী উৎসেচক। যা ডায়াটম কোষপ্রাচীরের মিউরামিন অম্ল ও যৌগিক শর্করার শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলে ।
...

বিচিত্র সব্যসাচীর এই দীর্ঘকবিতা। পরিবিষয়ী কবিতা – অর্থাৎ, অল্পকথায় - বহুভাবনার, বহু জ্ঞানক্ষেত্রের, অজস্র তথ্য-অনুপ্রাণিত, একাধিক আধেয়বস্তুসঞ্জাত এক জটিল, যৌগিক কবিতা। পরিবিষয়ী কবিতার তার আধেয় ও ভাষার ক্ষেত্রে সমূহ বা সমাহারিক। এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সব্যসাচী কবিতার এই জাটিল্যে অহেতুক তৃপ্তি পাচ্ছে না। সে মাঝে মাঝেই সব খুলে বলতে চাইছে, পলিগনাল বিভাজন পদ্ধতি যেন দেখতে পাচ্ছি আমরা। কবিতার উদ্ধৃত অংশ শুরু হচ্ছে মিঃ বীনের একটা সরল উক্তি দিয়ে – জীবন বৃত্তের আকারে গড়ে ওঠে। কিন্তু কে মিঃ বীন?

অনেকেই এঁকে চেনেন। ব্রিটিশ দূরদর্শন সিরিজের এক ডাকসাইটে কমিক চরিত্র মিঃ বীন। সব্যসাচী আণবিক জীববিজ্ঞানী। দীর্ঘদিন স্টকহোমে গবেষণাবাসের সময়ে সে ব্রিটিশ

দূরদর্শনের এই সিরিজ দেখতো এবং বীনকে ভালোবেসে ফেলে সে সময়েই। সেই শ্রীযুক্ত বীন, কমিকাল বীন তার মানসগুরুর ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ। সে কেবল দার্শনিক উক্তি করে। জীবন চক্রাকার – বহুকৌণিকের এই সরল এলাকায় খেলা শুরু হয়। এরপর সব্যসাচী এ বিষয়ে তার নিজস্ব দর্শন পেশ করে। বৃত্তের ভাবনাকে বদলে সে একরকমের কেন্দ্র তৈরি করে। একাকী কেন্দ্র, প্রদীপের মাঝখানে তার নির্লিপ্ত সলতের কথা বলে।

সম্প্রতি আমেরিকার ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের জীবনী পুরস্কার নিতে উঠে জন অ্যাশবেরি বলেছেন কবিকে সারাক্ষণ নিজের একাকীত্বের সাথে যুঝতে হয়, যুঝতে যুঝতে সে বুঝে যায় আসলে এই একাকীত্বটাই সব। এর বাইরে কিছু নেই। এইটা কখনো অভিযোগের জায়গা নয়। একজন পিয়ানিস্ট যখন একা পিয়ানোচর্চা করে তার গানঘরে, এক একদিন হয়তো তার সেরা বাজানোটা বেরিয়ে আসে, সেটা সে কেবল নিজে উপভোগ করে। সেদিন সে হয়তো বুঝতে পারে, কবির কাছেই এইটেই মহাজীবন। একমাত্র জীবন। সব্যসাচীর সলতে অ্যাশবেরির মন পড়ে ফেলেছে।

ক্ষণবিভাগের আলো
সারাজীবনের আলো
আলোর মধ্যিখানে নির্লিপ্ত পলতে
বাঞ্ছনীয় কাটা ঘুড়ি
ওহো তার নিজস্ব হাওয়া

কাঁপলো প্রদীপ

যত কাঁপা তত বেড়ে ওঠা
তত আলো
স্বাভাবিক বেড়ে উঠছে
আমি ও আমার স্বগতোক্তি

ব্যাস, এরপরেই কিন্তু পলিগনের অন্যপ্রান্তে চলে যাচ্ছে কবি। সে তখন ঘাঘু এক পর্যটক। এখানে এক বাহিরির দৃষ্টিভঙ্গিও আসছে। কবি যেন এক পর্যটকের মতো তার নিজের কবিতার অঞ্চল জরিপ করছে। স্ববিরোধ বা dissent-এর জন্ম হচ্ছে। প্রকৃতি দেখার মধ্যে সে লেখার আবেগ খোঁজে না।

ঘাঘু পর্যটক
আমি ত বসন্তের কাছে জানতে চাইবো না
উৎসবের মানে ও সূত্র
হলুদ উড়ে যাচ্ছে যে প্রাণপণ ঘুড়ি
তার কাছে বর্ণতার রাখা আছে ঘটনাপ্রদাহ

মানমন্দিরের দূরবীনে ছোট হচ্ছে আলো

তীব্র হচ্ছে

মানমন্দিরের দূরবীনের কাছে গিয়ে এবার কবি ইতিহাসের পাতায় চলে যায় এবং শেষ ছত্রে যেটা লেখে তাকে 'তোলপাড়'লিপিও হয়তো বলা যায়। এই অংশের লিপি নিয়ে একটু বলি। এটা সব্যসাচীর বিশেষত্ব। সে এক কল্প-ব্রিকোলাজ গড়ে তোলে এখানে। এক কল্প-বহুব্যাঞ্জন। দর্শন, জীববিজ্ঞান, মিথ, গ্রীক উপকথা, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করে এক অদ্ভুত ইন্সটলেশন। আর এখানে আবার বৃত্তাকার বা ঘূর্ণাকার জীবনের ধারণা ফিরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেই পারে। জটিল বহুকোণকে দেখানো হচ্ছে, পরক্ষণেই তার সুসম, সরল বিভাজন হচ্ছে, আবার এক সময় এই কল্প-ঘূর্ণি।

কার্নেল কাকে বলে? দৃশ্যমানতাই বা কী?

চিত্র-১ ও ২ এই কার্নেল জিনিসটাকে কিছুটা বোঝাতে সাহায্য করবে। হয়তো। চিত্র-১ এ মোটা কালো সরলরেখায় আঁকা রয়েছে এক অনুত্তল বহুকোণ। একে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির বড় ঘরের প্ল্যানের মতো ভাবা যাক, বোঝার সুবিধের জন্য। এই ঘরের মধ্যে ঢুকে কিন্তু তার সমস্ত অংশ দেখা সম্ভব না।

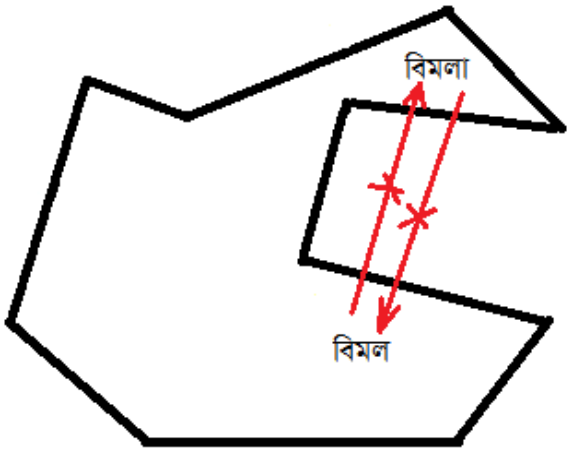

চিত্র-১ এক অনুত্তল ঘরের মধ্যে দুই বন্ধু বিমল ও বিমলা ও তাদের পারস্পরিক দৃশ্যমানতা

দুই বন্ধু বা এক দম্পতি, বিমল ও বিমলা এই ঘর দেখতে এসেছেন, এমন ধরা যাক। ছবিতে যেখানে বিমল দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে বিমলাকে দেখা সম্ভব না (ধরে নিতে হবে কোনো দেয়ালে কোনো জানলা নেই)। বিমলার পক্ষেও তার অবস্থান থেকে বিমলকে দেখা সম্ভব না। ঘর কনভেক্স না উত্তল বহুকোণ হলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো। অনুত্তলতার কারণই এই 'অদৃশ্যমানতা'।

এবার দেখা যাক চিত্র-২। এই ঘরের মধ্যে দুটো পাটাতন তুলে দেওয়া হয়েছে, সাময়িক দেয়াল – একটা দ১দ২, অন্যটা দ৩দ৪। এতে বড়ো ঘরটা তিনটে ঘরে ভেঙে গেছে –

তিনটা এলাকা – এ১, এ২, এ৩। এর মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন উপ-ঘর এ-২ কে আমরা বলবো এই অনুত্তল বহুকোণের 'কার্নেল' (kernel) বা আঁটি। কিন্তু কেন?

এর কারণ এই যে একমাত্র এ-২ উপঘরে এসে দাঁড়ালে, বিশেষ করে সে ঘরের দুটো দরজা – দ১দ২ আর দ৩দ৪ – এ এসে দাঁড়ালে গোটা ফ্ল্যাটটা, মানে, গোটা বহুকোণটা দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই বিমলা ওই বহুকোণের যেখানেই থাকুক, বিমল যদি এ-২ উপঘরে থাকে, সে তাকে দেখতে পাবে। চরম ক্ষেত্রে সে ঘরের দুটো দরজার কোনো একটায় দাঁড়িয়ে অন্তত দেখতে পাবে। বিমলাকে দেখতে তাকে ঘর ছাড়তে হবে না।

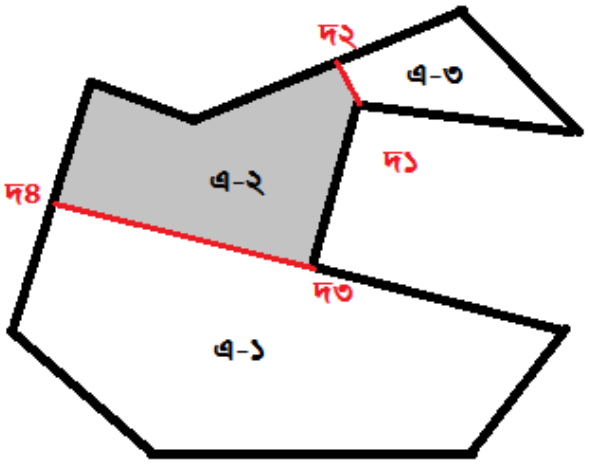

চিত্র-২ এক অনুত্তল বহুকোণ ও তার 'কার্নেল' এ-২

দ১দ২ ও দ৩দ৪ – এই দুটো পাটাতন তুলে দিয়ে আমরা গোটা ঘরটাকে তিনটে উত্তল এলাকায় ভগ্নিত করেছি।

উত্তলতার সুবিধে কী? অনুত্তল বহুকোণকে ভাঙা জরুরী কেন?

উত্তলতার একটা বড় সুবিধে দৃশ্যমানতা। এটা গণিতবিদের চোখ দিয়ে না দেখে আলোকচিত্রির লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখলে আরো সহজভাবে বোঝা যাবে। আর আর্ট এখান থেকেই আসবে (যার গাণিতিক প্রমাণ, এমনকি উপপাদ্যও আছে)। কোনো একটা দিকে লেন্স তাক করলে তার ভেতরে যেটুকু ধরা পড়ে সেটাই একরৈখিক দৃশ্যমানতা। একটুও না নড়ে, ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলোকচিত্রি যদি তার ক্যামেরা ঘোরান, যতটুকু ধরা পড়বে ততটুকুই তার 'visibility' বা স্থানিক দৃশ্যমানতা। উত্তল এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি আলোকচিত্রি তার ক্যামেরা ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরান, পুরো চরাচর তার দেখতে পাবার কথা, যদি চরাচর উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এলাকা অনুত্তল হলে সবটা দেখা যাবে না। বহির্প্রকৃতি ছেড়ে শাহরিক ভুলভুলাইয়াতে ঢুকে পড়লে যেটা হয়, হাজারো দৃশ্যিক বাধা আসতে থাকে, দৃশ্যমানতা খন্ডিত হয়ে পড়ে – অনুত্তল, দেখা বিঘ্নিত হতে থাকে, কঠিনতর হয়।

এবার আলোকচিত্রিকে তার অবস্থান থেকে তুলে নিতে হবে। তার জায়গায় বসাবো কবিকে। ভুলে যান লেন্স। তার পরিবর্তক হয়ে আসুক 'কবির চোখ' যার লক্ষণপ্রবণতায় আমরা আশা করবো শুধু প্রচ্ছদ বা প্রচ্ছদপ্রবণ দেখা থাকবে না; এগুলো ঠিকভাবে ভাবতে পারলেই

কবির দৃশ্যমানতা, তার সমস্যা, পারদর্শিতা, সীমাবদ্ধতা, ক্ষমতা এবং 'উত্তলতা' ও 'অনুত্তলতার' সংজ্ঞাগুলো কিছুটা বিমূর্ত হয়ে উঠবে যেমন, তেমনি অন্যদিকে তার সরলতাও অবিকৃত থেকে যাবে। যদি পথ হারালেই আমরা বারবার আলোকচিত্রির উদাহরণে ফিরে যাই। যেতে পারি।

দৃশ্যমানতা অনুত্তল হয়ে উঠলে, আলোকচিত্রি তার অবস্থান বদলান, টেকনিক পাল্টান, অনুত্তল জায়গার 'কার্নেল' টা খুঁজে বের করেন স্বাভাবিকভাবেই, আর সেটা পেয়ে গেলেই তার দৃশ্যমানতা বেড়ে যায়। সম্পূর্ণ হয়। কবিতা বা যেকোনো শিল্প, এবং বড়ো বা আদিবিদ্যক অবস্থায় যে কোনো দেখাই অবশ্য আংশিক, অসম্পূর্ণ। তবু কার্নেল খুঁজে পেলে দৃশ্যমানতা বাড়বেই – কেননা অনুত্তল জায়গাগুলো একাধিক উত্তল এলাকায় ভাগ ভাগ হয়ে যাবে।

এখান থেকে বিমূর্ত সমস্যা বা প্রশ্নটাকে মূর্ত করতে চাইছি তা হলো কবি কীভাবে দেখবেন? কীভাবে দেখলে তার দৃশ্যমানতা বাড়ে, কীভাবে সে অদৃশ্যের কার্নেল খুঁজে পায়? কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে 'দৃশ্যমানতা', 'দৃষ্টি' সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই অনাক্ষরিক, এটা মনে রাখা জরুরী।

ভূদৃশ্য বা ল্যান্ডস্কেপ বহু কবি ও কবিতাকে আজো অনুপ্রাণিত করে চলেছে। বাংলা বা জাপানী বা আরো বড় করে বলবো এশিয় অর্থে কবিতাশিল্প আজো মোটামুটি প্রকৃতি, নিসর্গ ও দৃশ্যনির্ভর। নৈসর্গিক বা দৃশ্যিক বর্ণনা, বন্দনা ও বিবরনীর মাধ্যমেই কবিতা মোটামুটি খাড়া হয়। নাম না করে এক কুশলী, কৃতি, প্রবীণ বাঙালি কবির একটা কবিতা পড়া যাক -

দৃষ্টিমেঘ কালো গাছ গোলগাছ মাটি ঊর্ধগামী
কারুরই সংকোচ নেই পরমুখাপেক্ষী নয় কেউ
পুণ্যফলে মহীরুহ ভেতরে অসহ্য টান তবু

স্রোত গিলে ফেলছে গান অন্ধকার সংগ্রহ করেছে
শিয়রে পাতার জন্য। অগ্নিকাণ্ডে পাখি উপস্থিত
অবতল লুপ্ত হোক, এতক্ষণ সমস্ত অঞ্চল

শান্ত ছিলো, প্রদক্ষিণরত নীল কাল্পনিক রেখা
কল্পনা করিনি বলে আকস্মিক সংকেত পেলাম
বাঁ দিকে দর্শন, যেন প্রয়োজনে তীরচিহ্ন গতি

পূনর্বাসনের আগে একবার অসম্ভব দেখে যাবো
ঝড় নিয়ন্ত্রণ হয় নিজের ইচ্ছায়। চেয়ে দেখি
চূড়ায় কঙ্কাল, কণা অব্দি ক্রোধ অবশিষ্ট নেই।

ডাণায় শস্যের শব্দ দৃষ্টিতে লবণ চেখে বুঝি
কৃষিকাজ জলভাত বলেই পাখির নাম প্রতিভা হয়েছে

চমৎকার, নিটোল এই কবিতাকে সাবেকি বাংলা কবিতার এক আদর্শ নমুনা হিসেবে নেওয়া যায়। ভেবে দেখবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় সমস্ত 'সফল' (অর্থাৎ আলগা গণস্মৃতির মাথামোটা বেড়া টপকে আজো জনপ্রিয়) কবিতাই কিন্তু এই প্রবণতারই কবিতা – নিসর্গ ও দৃশ্যমানতার লতার শেকলে বাঁধা। প্রায় সমস্ত শৈল্পিক, জৈবনিক, দার্শনিক ভাবনের সূত্র এইসব দৃশ্য। এবং প্রথাগত ভাবেই তা মোটামুটিভাবে একটা আদিবিদ্যক জায়গাতেই আটকে থাকছে। এটাই এই ধারার কবিতার কৃতিত্ব। এর বেশি কিছু না। বাকিটা, যে চমৎকারিত্বের কথাই আমরা

বলি সেটা কিন্তু কবির ভাষা, বাক্যগঠন, বয়ানশৈলি, ছন্দ – ইত্যাদি গাঠনিক গুণ থেকে আসছে। 'উদ্যানে ছিলো বরষাপীড়িত ফুল' – এভাবে খুব কম কবি লিখতে পারেন – একথা শুনেছি বহুবার। এর সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়েও তবু বলবো, লক্ষ্য করুন একটু আগে কী বললাম – লিখনশৈলির জোরেই পঙক্তিটা স্মরণীয়, কিন্তু ছবি নির্ভর এক লাইন – ফুলের বাগানে বৃষ্টি পড়ে – যতোই সূক্ষ্মতা আমদানী করা হোক এর মধ্যে, এর বেশি কিছু নেই, বলার কথা এই কুটুরির মধ্যেই ঠোক্কর খেয়ে ফিরবে প্রাচীন মন্দিরের সিলিঙের বাদুড়ের মতো। এবার বিলেতের এক কবি, সত্তরোর্ধ জেরেমি প্রিন, যাঁর কবিতার মধ্যেও নিসর্গপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রিনের প্রথম জীবনের একটা লেখা থেকে উদ্ধার করলাম এটুকু –

Now the willows on the river are hazy like mist
and the end is hazy like the meaning
which bridges its frozen banks. In the field
of view a prismatic blur adds on
rainbow skirts to the outer leaves.
They appropriated not the primary
conditions of labour but their results;
the waters of spring cross under
the bridge, willow branches dip.
The denial of Feudalism in China
always leads to political errors, of an
essentially Trotskyist order:
Calm is all nature as a resting wheel.
The red candle flame shakes.

(The Oval Window)

সেই সাবেকি দৃশ্য দিয়েই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু প্রিন চলে যেতে পারলেন কিছুটা কবিতাতত্ত্বে (the end is hazy like the meaning), পাতার ধারের নামধনু আলোর পাড় তাকে মনে করিয়ে দিলো - They appropriated not the primary conditions of labour but their results -এর কথা, রাজনৈতিক ভাবনার দিকে ওঁকে টানলো সেতুর নিচের ঝর্নায় নুয়ে তৃষ্ণাতুর উইলোশাখা (The denial of Feudalism in China/always leads to political errors, of an/ essentially Trotskyist order)।

আমার মতে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কবিতাই গাঢ়তম, মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ও দৃশ্যতৃষ্ণা দিয়ে 'দেখতে চাইবার' কবিতা। বিমূর্তভাবে দেখলে আসলে সমস্ত তথাকথিত 'দৃশ্যমানতা'র মধ্যেই কিন্তু নানা রকমের অনুত্তলতা আছে। যা আমাদের সবটা দেখতে দিচ্ছে না। শুধুমাত্র একটা ভাসা ভাসা ব্যক্তিগত দর্শন গড়ে তুলেই আমাদের তথাকথিত 'ভালো' কবিতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি ৯০% কবিতা সেইটুকুও গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে, সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে – কথা বলার কায়দা, শব্দচয়ন, ভোক্যাবুলারি, অভিব্যক্তি – আপামর 'সফল' বাংলা কবিতা, কিছু বিচ্ছিন্নতা বাদ দিয়ে, আসলে অভিব্যক্তিবাদের কবিতা – Expressionist Poetry।

সুতরাং কার্নেল, যা কিনা কবিতার ক্ষেত্রে এক বিমূর্ত পরিসর, হলো সেই জায়গাটা যেখানে, যে চৌহদ্দির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে অনেকটা দেখা যায়। অনেক কিছু। শেষমেশ

যদিও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে, আর সেটা আছেই বলেই আমরা আজো কবিতা লিখি। কতকিছুই পিকাসো আঁকেননি, কতকিছুই রবির কলমে নেই, আইনস্টাইনের বাইরেও একটা বিজ্ঞান ছিলো ও আছে।

সার্ভেলেন্স – সাহিত্যে সার্ভেলেন্স কী?

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৪